BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg2
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 14-21

ভারতী পত্রিকায় শরৎকুমারী চৌধুরানী সহজ-সরল জীবনবোধের অপর নাম

সুস্মিতা বণিক

সারসংক্ষেপ

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে ঠাকুর-বাড়ির 'ভারতী' পত্রিকার প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘস্থায়ী এই পত্রিকা জন্ম দিয়েছিল বহু লেখিকার, যাঁরা সমকালীন পাঠকদের মনে জায়গা করে নেওয়ার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শরৎকুমারী চৌধুরানী, সহজ-সরল লেখনীর গুণে তিনি অনায়াসেই তুলে ধরতে পেরেছিলেন তৎকালীন সমাজের নানা চিত্র, নিজের সরস ভাবনার ছোঁয়ায় তাদেরকে করে তুলেছিলেন জীবন্ত। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর মোট রচনার সংখ্যা ১১টি। রচনাগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা, সামাজিক বোধ, লেখন-রীতির যে প্রকাশ ঘটেছে, তারই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সুস্মিতা বণিক
এম এ, বি এড, এম ফিল.
(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
পিএইচডি (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
বাংলা বিভাগ
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: baniksusmita2012@gmail.com

মূলশব্দ

মেয়ে-যজ্ঞি, মেয়ে-মজলিস, পাল্কি ওঠা, লুচি তোলা, সরা বাঁধা, শিল্পাশ্রম

ভূমিকা

উনিশ শতককে বলা হত 'পত্র-পত্রিকার যুগ'। এই যুগে বহু পত্রিকা জন্ম নিয়েছে, যদিও তার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল স্বল্পজীবী, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সমন্বিত পত্রিকার সংখ্যাও নেহাত মুষ্টিমেয় ছিল না। 'ভারতী' (১২৮৪-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ; ১৮৭৭-১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ) পত্রিকা ছিল এই দ্বিতীয় শ্রেণির সদস্য। পুরাতনপন্থী ও প্রগতিশীল—এই দুই সমাজের মধ্যবিন্দুতে ছিল এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান। দেশীয় সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ-মনস্কতা, সমকালীন আবহের সুরুচিকর প্রতিফলন ও দেশীয় ভাবধারায় দেশে-বিদেশে প্রাপ্ত জ্ঞানের সুস্থ আলোচনাই ছিল এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য।

বিখ্যাত বহু লেখকের পাশাপাশি অসংখ্য মহিলা-লেখকের রচনাও 'ভারতী'কে সমৃদ্ধ করেছে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে। শরৎকুমারী চৌধুরাণী ছিলেন এই লেখিকা-কুলের মধ্যে অন্যতম এক রত্ন। জন্ম: ১৫.৭.১৮৬১, মৃত্যু:

১১.৪.১৯২০। বিশিষ্ট গদ্যলেখিকা। পিতা: শশীভূষণ বসু। শৈশবে পিতার কর্মস্থল লাহোরে বেড়ে উঠেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন লাহোরিনী। তাঁর স্বামী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তিনি ঠাকুর-পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে এঁরা উভয়ে উৎসাহী সভ্য এবং মাতৃভাষার পরম অনুরাগী ছিলেন। 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'ধ্রুব', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর স্বাক্ষরহীন বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র 'শুভবিবাহ' ছাড়া আর কোনো রচনাই তাঁর জীবৎকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কিছুকাল আগে তাঁর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধ : কলিকাতার স্ত্রী সমাজ (ভাদ্র, কার্ত্তিক, ১২৮৮), শ্বাশুড়ী বৌ (আষাঢ়, ১২৯৮), একাল ও একালের মেয়ে (আশ্বিন, মাঘ, ১২৯৮), স্বায়ত্ত সুখ (কার্ত্তিক, ১৩০৬), শ্রী পঞ্চমী (আষাঢ়, ১৩১৫), মেয়ে যজ্ঞি (ভাদ্র, ১৩১৫; অগ্রহায়ণ, ১৩১৭), স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬), ত্রিপুরার গল্প (ভাদ্র, ১৩১৬), মেয়ে যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা (পৌষ, ১৩১৬), লক্ষ্মীশ্রী (পৌষ, ১৩১৭), নারী শিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম (ফাল্গুন, ১৩২৩)।

পদ্ধতি : প্রবন্ধটিতে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি আকর বা উৎস পত্রিকা 'ভারতী' ও বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : 'ভারতী' পত্রিকার লেখিকাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্টজন হলেন শরৎকুমারী চৌধুরানী। পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকেই এর সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ। "শরৎকুমারী ও তাঁর স্বামী অক্ষয় চৌধুরী 'ভারতী'র পরিচালন সমিতির সক্রিয় সদস্য শুধু ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যস্ততার জন্য অনেক সময়ই পত্রিকার মূল দায়িত্ব বহন করেছেন অক্ষয় চৌধুরী। গদ্য-পদ্য উভয় বিষয়েই তিনি এই কাজ করেছেন।"[১]

১২৮৮ থেকে ১৩২৩ পর্যন্ত শরৎকুমারী দেবীর বিভিন্ন ধরনের রচনা প্রকাশিত হয় 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ধ্রুব', 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি নানা নামকরা পত্রিকায়। এর মধ্যে দশটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায় 'ভারতী'তে। এই প্রবন্ধগুলোতে অধ্যাপক ড. জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় দুটি ধরন লক্ষ্য করেছেন। এক) সমাজ বিষয়ক ও দুই) স্মৃতিচারণমূলক। প্রথম জাতীয় রচনাগুলোতে "উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের কলিকাতার সমাজ, অন্তঃপুরের কথার বিস্তৃত বর্ণনা পেয়ে যাই।....এ শুধু বর্ণনা নয়, যেন জলছবি। প্রতিটি ঘটনা অভিজ্ঞতাপ্রসূত, তাই ঘটনাগুলোর বর্ণনায় নারী-পুরুষ উভয়ের অবস্থান, উভয়ের মতামত, মতাদর্শগত মিল অমিল সবই অনুপুঙ্খভাবে লিখিত হয়েছে।"[২] ঊনবিংশ শতকের স্ত্রী সমাজের একটি জীবন্ত ছবি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন শরৎকুমারী, সিমলায় বসে লেখা 'কলিকাতার স্ত্রী সমাজ' (ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৮) রচনায়। এই প্রবন্ধের নেপথ্য ইতিহাসটি তিনি বলেছেন পরবর্তীকালে 'মেয়ে যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা' (পৌষ, ১৩১৬) প্রবন্ধে। 'ভারতী'র প্রথম প্রকাশের যুগে নিজের জীবন-অভিজ্ঞতাকে বহু মানুষের অনুরোধে ও জোরাজুরিতে লিপিবদ্ধকরার পর গুরুজনের কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভোগের ঘটনাটিকে অনলংকৃত ভাবেই এখানে প্রকাশ করেছেন তিনি।

মেয়ে মজলিসে কী কী ঘটে, নিমন্ত্রিতদের কী অবস্থা হয়, মেয়েদের বিচিত্র সাজপোশাকের রূপ, নানা বয়সের মেয়েদের মধ্যে আলাপচারিতার রকমফের ইত্যাদি এত সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ সজীব ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পড়ে অবাক হতে হয়। সাহিত্য রচনায় অনভিজ্ঞা এক নারী যে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এমন উজ্জ্বলভাবে কথায় আঁকতে পারেন তা শরৎকুমারীর লেখা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়। সমকালীন কলকাতার স্ত্রী সমাজের রুচি, চিন্তা, সংস্কার, আচার, চাহিদাগুলোকে তিনি কয়েকটি মাত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন। ঊনবিংশ শতকে সমাজবদলের চিত্রটিকে সঠিকভাবে চিনে নিতেও তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেন। মেয়ে মজলিসের নানা ঘটনা, গোলমাল, স্বার্থপরতা, স্বজনপোষণ প্রভৃতির পাশাপাশি সমকালীন সমাজে প্রচলিত কতগুলো নতুন শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। যেমন– লুচি তোলা, সরা বাঁধা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলোকে সরস বর্ণনার মধ্য দিয়ে বেশ উপভোগ্য করে তুলেছেন তিনি। আরও একটি স্বভাব আগে মেয়েদের মধ্যে ছিল, তার কথাও জানাতে ভোলেননি, "আগে আগে দেখতুম বড় মানুষের মেয়েরা রূপার গেলাস, রূপার পানের ডিপে সঙ্গে নিয়ে আসতেন, সক্কলের মাঝখান নিজের গ্লাসে জল খাওয়া হোত, পান খাওয়া হোত- এখন আর তা নেই, গেলাস তো আনেই না, কেউ কেউ পান আনে কিন্তু অত দেখিয়ে দেখিয়ে খায় না।"[৩] মেয়ে-যজ্ঞি বা মেয়ে-মজলিসের গতে বাঁধা নিয়ম অর্থাৎ নিমন্ত্রিতদের জন্য 'বাঁধা আদর'- তাদেরকে পালকি থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে যাওয়া, খাবার সময় ডেকে নিয়ে যাওয়া আর খাবার শেষে গিন্নির দর্শন দেওয়ার ঘটনাগুলোতে যে ত্রুটি হবার জো নেই- তা জানিয়ে তিনি এও বলেন যে, সকলে এক রকম নন। 'পাল্কী ওঠা'র বিষয়টি শরৎকুমারী বেশ রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতার ছবি বলে তা বেশ উপভোগ্যও হয়েছে এবং এই ঘটনা থেকে বিভিন্ন নারীর মানসিক রূপ বা স্বভাবের পরিচয় আমরা পাই। যেমন, "বাড়িতে শাশুড়ি যদি বউয়ের গলার স্বরটি শুনতে পান তো রেগে বাড়ি মাথায় করেন- কিন্তু পালকিতে উঠবার সময় যদি সেই বউয়ের গলা শোনেন- তাতে বউয়ের কিছুমাত্র লজ্জার ত্রুটি দেখেন না, তাতে তাঁর রাগ হয় না- বরং বউকে পালকি ধরবার জন্য চেঁচামেচি করতে উত্তেজনা করা হয়।"[৪] লেখিকা যে সরা পেয়েও বেঁধে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন না- এই ঘটনা শুনে স্বয়ং নিমন্ত্রণকারিণী কর্ত্রীও অবাক হয়ে যান। এতে সেই চিরন্তন সত্যই প্রকাশ পায় যে, সামাজিক নিয়ম যত খারাপই হোক না কেন, মানুষ তাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সেই ব্যাপারে তার ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়।

'মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলা' (পৌষ, ১৩১৬) প্রবন্ধে একটানা, ঝরঝরে ভাষায় বিভিন্ন নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রণকারীদের আচরণগত নানা অসঙ্গতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি আমাদের সমাজের বহুবিধ নিয়ম ও তার সুফল-কুফলের প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি শরৎকুমারী আকর্ষণ করেছেন। তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর সহজ ভাব, অভিজ্ঞতা-প্রসূত জীবনের নানা জীবন্ত বর্ণনা। পরিণত বয়সে নিজের ইচ্ছেয় প্রবন্ধ লিখতে বসে নিজের সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, সমাজে মেয়েদের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও নিজের মত প্রকাশ করেছেন লেখিকা। পিতা, স্বামী, পুত্রকে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করা, যোগ্য গৃহলক্ষ্মী হয়ে ওঠাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় কাজ বলে তিনি মনে করেন, তবুও নারী-শিক্ষার মূল সমস্যাটিকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, "বর্ণ পরিচয়ের জ্ঞানশূন্যা স্ত্রীলোক হাজারে একটীও মিলিবে না– কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালী রমণীর উন্নতি কতটুকু হইয়াছে?....সেই কথামালা, বোধোদয় পড়াই শেষ পড়া। সেই তের/চোদ্দ বৎসর বয়সে বালিকা মা হইয়া শিশুপালনের ভার গ্রহণ করে। সে যে তখনও নিজেও মানুষ

হয় নাই– সে আবার অন্যকে মানুষ করিবে কি?"[৫] এই শিক্ষার প্রণালী না বদলালে বাস্তবিক নারী-উন্নতি সম্ভব নয়– এই সারটুকু তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন।

উৎসবের দিনে নানা আলাপচারিতা, মেয়েদের সাজপোশাক, সন্তানকে নিয়ে নিমন্ত্রণ বাড়িতে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া, কলহ, মন-কষাকষি, মহিলাদের একের অপরের সম্বন্ধে বিচিত্র মানসিকতা- সমস্তই অতি সহজ-সরল ভাবে বলে গেছেন লেখিকা। উৎসব বাড়িতে বিলি-ব্যবস্থার চূড়ান্ত অরাজকতা– তবে তার মধ্যেই একটি ব্যাপারে তিনি খুশি– ওই সব অনুষ্ঠানে খাবার বাঁধাছাঁদার ব্যাপারটি ক্রমে বন্ধ হয়েছে বলে।

প্রসঙ্গতঃ তিনি সমকালীন মহিলাদের সাজপোশাকের উন্নতির কথা বলেছেন। মেয়েদের সংস্কার-মুক্তির প্রসঙ্গ যেমন তিনি এনেছেন, তেমনি অল্প বয়সী মায়ের বহু সন্তানকে সামলানোর অক্ষমতাকেও তুলে ধরেছেন। কথায় কথায় মেয়েদের তুলনায় পুত্র-সন্তানের প্রতি আদরের অতিরেকের চিত্রটিও এখানে আমরা পাই। মেয়েদের মধ্যে গৃহস্থালির কাজকর্মে অনীহার বিষয়টিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। নারী সমাজের প্রকৃত উন্নতি, কাজেই, তাঁর মতে তেমন হয়নি। ড. জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমারীর এই প্রবন্ধ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তাতে লেখিকার মনোভাব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে, "বিশেষ ভাবনা ও উদ্দেশ্য নিয়েই এ প্রবন্ধে তিনি লিখছেন যে, সুশিক্ষিত নারীরা এই প্রবন্ধ পাঠ করে যদি নারী কল্যাণে, নারীর উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন তবেই তার কলমের সার্থকতা।"[৬]

এই প্রবন্ধের অনুবৃত্তি হিসেবে অগ্রহায়ণ, ১৩১৭-তে তিনি 'মেয়ে-যজ্ঞি' নামক প্রবন্ধটি লেখেন। ভূমিকায় তিনি বলেন আগের প্রবন্ধটি লেখার জন্য আত্মীয়স্বজনের বাক্যবাণে নিজের আক্রান্ত হওয়ার কথা। এখানে তিনি পাঁচটি পত্র 'ভারতীর পাঠক-পাঠিকার গোচরার্থ' প্রকাশ করেছেন। এগুলো তাঁর প্রবন্ধের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তবে এই চিঠিগুলোর বক্তব্য বেশ গোছানো এবং লেখিকাদের ভাষাও বেশ সহজ-সরল ও স্পষ্ট। ব্যঙ্গাত্মক পত্রগুলোয় লেখিকারা "শরৎকুমারীকে একপেশে সমালোচক বলে মনে করেছেন।"[৭] আর এই পত্রগুলো প্রকাশের মাধ্যমে শরৎকুমারীও নিজের মনের স্বচ্ছতা বজায় রেখেছেন। সুলিখিত এই প্রবন্ধ দুটোয় তৎকালীন নারী-সমাজের বাস্তব চিত্রটি স্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

১২৯৮, আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শরৎকুমারীর 'শ্বাশুড়ি-বৌ' প্রবন্ধটি লেখিকার আগ্রহব্যঞ্জক রচনাশৈলীর আরেকটি নমুনা। বাঙালির মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের শাশুড়ি-বউয়ের চিরন্তন সমস্যা নিয়ে এখানে কলম ধরেছেন তিনি। প্রথমেই শরৎকুমারী শাশুড়িদের বধূর প্রতি বিরূপ মনোভাব ও উষ্মার কথা বলেছেন। বিষয়টি যে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি, তা অবশ্য বেশিরভাগ সময়ই তাদের মনে থাকে না। অথচ শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্ক অতি মধুর হয়ে উঠতে পারে স্বভাব ও আচরণের একটু হেরফেরেই। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চিত্রই বেশি দেখা যায়। বধূ-বরণের সময় থেকেই শাশুড়ি বউয়ের প্রতি বিরূপতা পোষণ করতে থাকেন। এর কারণ ছেলের জন্মের পর থেকেই হৃদয়ে পোষণ করে থাকা নানা স্বর্ণালি স্বপ্ন- যার প্রায় সবটা জুড়ে থাকে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বের কল্পনা। কিন্তু বাস্তবের চিত্র যখন অন্যরকম হয়ে ওঠে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, হয়তো বা একটি দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে চাহিদার চেয়ে অনেক কম অলংকার ও দানপত্র নিয়ে গৃহ প্রবেশ করে তখনই শুরু হয় সমস্যা। রূপের প্রশ্নেও, বধূ প্রায় কখনোই শাশুড়ির মন জয় করতে পারে না। ওই নবাগতা, সদ্য পিতা-মাতার আশ্রয় ছেড়ে আসা মেয়েটির ভয়ার্ত মানসিকতাও এখানে লেখিকা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিবাহে বর-পণের বিষয়টিই মূলত শাশুড়ির বউয়ের প্রতি বিরূপতার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার পুত্র ও পুত্র-বধূর সুমধুর সম্পর্কও বেশিরভাগ শাশুড়ির চক্ষুশূল। বধূ অবস্থায় তিনি যখন নিজের শাশুড়ি কর্তৃক অত্যাচারিত হয়েছেন, তখন নিজের বউকে মেয়ের সমান স্নেহ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা যাঁরা করেন, সময়কালে সেই শপথ ভুলে তারাও চিরাচরিত শাশুড়ি হয়ে ওঠেন। অথচ "বধূকে নিজ সন্তানের মত মনে করাই কর্ত্তব্য, সুন্দর কুৎসিত সন্তান মায়ের নিকট যেমন সমান আদরের, তেমনি কুৎসিতা বধূকেও আদর করিয়া লইলে ভবিষ্যতে শ্বশ্রূ ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে পারেন। বরং দুহিতা পর হইয়া যায়, বধূই গৃহলক্ষ্মী নামে অভিহিত হন।"[৮] একই শাশুড়ি পুত্রবধূ ও জামাতার বেলায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকেন– জামাই আদর-যত্নের আতিশয্যে তাঁকে মা বলে ভাবে, পাশাপাশি বধূ লাঞ্ছিত হয়ে তাঁকে বাঘিনী মনে করে। অথচ শ্বশ্রূ-বধূ সম্পর্কটিতে থাকা উচিত ভালোবাসা, পরস্পর নির্ভরশীলতা, স্নেহ ও যত্ন এবং ভক্তি। প্রবীণার তরফ থেকে যত্ন নেওয়া শুরু হলে নবীনার মনেও যত্নের ভাব ও ভক্তি সঞ্চারিত হতে পারে। রচনাটিতে অভাগিনী বালিকা-বধূদের প্রতি লেখিকার সমবেদনা ও ভালোবাসা হৃদয়স্পর্শী রূপ নিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, শরৎকুমারীর রচনাশৈলী অত্যন্ত সাবলীল এবং বাস্তব-অভিজ্ঞতা-প্রসূত। শাশুড়ি ও বউয়ের গৃহস্থালীর নানা চিত্র তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা কালে প্রসঙ্গক্রমে লেখিকা মহাভারতের কুন্তী ও দ্রৌপদীর সম্পর্কের মিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছেন। বধূকে যত্ন-স্নেহের পাশাপাশি শিক্ষা দেওয়াও শাশুড়ির কর্ত্তব্য— কথাটিকে তিনি মহাকাব্যিয় চরিত্র দুটির কার্যকলাপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই বুঝিয়েছেন। কুন্তী যেমন দ্রৌপদীকে ভালোবেসেছিলেন, পুত্রদের দ্যুতক্রীড়ায় পরাজয়, রাজ্য হরণ ও পুত্রগণের নির্বাসন অপেক্ষাও উন্মুক্ত সভাস্থলে দ্রৌপদীর অপমানে যেমন দুঃখ পেয়েছিলেন, কৃষ্ণাও শাশুড়িকে ততটাই ভক্তি ও যত্ন করতে শিখেছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত এই সম্পর্কটির মাধুর্য যদি আমাদের ঘরে ঘরে শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে থাকত, তাহলে দৈনন্দিন সংসার মধুরতম স্বর্গে পরিণত হতো। আমাদের পৃথিবী আরো সুন্দর হয়ে উঠতো।

কালের পরিবর্তনে ও বিদেশী শাসকের অধীনে থেকে অন্যরকম সংস্কৃতি ও উন্নতির স্বাদ আমরা পেয়েছি, কাজেই সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তাতে বসবাসকারী মানুষেরও পরিবর্তন হয়েছে। নব্য পুরুষ সম্প্রদায় ইংরেজদের দেখে মুগ্ধ এবং সেই রকম হওয়ার চেষ্টাতেই ব্যগ্র। আর এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের বাঙালি যুবকদের রুচি রীতিনীতি আচার-ব্যবহার অনুসারেই সমকালের মেয়েরা গঠিত হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেছেন শরৎকুমারী তাঁর 'একাল ও একালের মেয়ে' (ভারতী ও বালক, মাঘ, ১২৯৮) প্রবন্ধে। আগেকার দিনের পোষাক-পরিহিতা ও রুচিসম্পন্না মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নেওয়া এখনকার ছেলেদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও, অতীতের মেয়েদের গুণাবলী স্মরণ করে এ যুগের মেয়েদের প্রতি পুরুষ খড়্গহস্ত।

শরৎকুমারী দেখিয়েছেন, দূর থেকে দেখা সুন্দর পল্লীর ছবি-সদৃশ কুঁড়ে ঘরে থাকা যেমন শহুরে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি পূর্ণরূপে সেকালের মেয়েদের মত হলে একালের মেয়েদেরকে নিয়ে সংসার করা নব্য যুবকদের পক্ষে অসম্ভব বোধ হতো। স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধীর সংখ্যা কম নয় সমাজে, তবুও যে ছোট ছোট মেয়েদেরকে একটু লিখতে পড়তে শেখানো হয়– তা বিয়ের বাজারে তাকে যোগ্যতর করে তোলার জন্যই। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত বর অশিক্ষিত কনের কথা শুনলে দুঃখ পান। লেখাপড়া যদি আবশ্যক হয়েই দাঁড়ালো, তাহলে মেয়েদের ভাব ও রুচির পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবেই- লেখিকার মতে এটাই বাস্তব।

'অন্তঃপুর প্রসঙ্গ/লক্ষ্মীর শ্রী' রচনাটি প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩১৭ সংখ্যায়। সেখানে তাঁর আক্ষেপ, "আচার অনুষ্ঠানের ত্রুটির দিকে যেমন আমাদের খর দৃষ্টি অপরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই।"[৯] সাধারণ বাঙালি- তা সে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা ধনী-যাই হোক না কেন, দৈনন্দিন শারীরিক ও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়াকে যে বাহুল্য মনে করে-সেই বিষয়ে লিখতে গিয়ে প্রাত্যহিক জীবনকে খুব সহজভাবে তুলে ধরেছেন শরৎকুমারী। বরং তিনি ফিরিঙ্গিদের পরিচ্ছন্নতার মনোভাবকে প্রশংসা করেছেন। এই অপরিষ্কার মানসিকতা বাল্যকাল থেকেই যেহেতু মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে, কাজেই শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েদের মনে পরিচ্ছন্নতার বোধ জাগিয়ে তোলা উচিত। এর জন্য প্রয়োজন স্বল্প আয়াস ও স্বল্প ব্যয়। আর মানসিকতা তৈরি করে দিতে পারেন বাড়ির মেয়েরা বা মায়েরা- 'সকড়ির বিচার' ও 'শুচির আচারের' সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা মেলালে প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরই সৌন্দর্যময় হয়ে উঠতে পারে। ড. জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে বলেন, "রচনাটি আজও প্রাসঙ্গিক। শরৎকুমারীর সংসার ও সমাজের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রশংসনীয় ও উপযোগী।"[১০]

ফাল্গুন, ১৩২০ সংখ্যায় শরৎকুমারী লেখেন 'নারীশিক্ষা ও মহিলাশিল্পাশ্রম' নামক রচনা। তাঁর ভাষায় রয়েছে এক সুললিত সহজভাব, অনবদ্য সরলতা। ঝরঝরে, স্পষ্ট ভাষায় ও ভাবে নিজের অন্যান্য রচনার মতোই এখানেও স্বচ্ছন্দ তিনি। ১২৯৩ সালের বৈশাখে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন সখি-সমিতি, যার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়, দেখাশোনা, মেলামেশা, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা- বিধবা রমণীকে সাহায্য ও অনাথাকে আশ্রয়দান ইত্যাদি। কয়েক বছর অসম্ভব উৎসাহ ও ধৈর্য সহকারে নানা বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্য দিয়ে সমিতি চালিয়ে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তারপর অল্প দিনেই সখি-সমিতি লোপ পায়। সেইসব স্বর্ণালী দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে শরৎকুমারী বিশেষভাবে বলেছেন শিল্পমেলার কথা। শুরুতে তিনি এই ধরনের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের প্রতি নিজেদের, বিশেষ করে শ্রীমতি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর অনুরাগের কথা বলেছেন। তবে স্বর্ণকুমারী দেবীর কর্মদক্ষতা, মানবানুরাগের কাহিনী তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

তবে সখি-সমিতি নয়, এখানে শরৎকুমারীর মূল লক্ষ্য স্বর্ণকুমারী-কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী-স্থাপিত মহিলা শিল্পাশ্রমের কথা বলা। সখি-সমিতির একটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে গ্রহণ করেই এই আশ্রম স্থাপন করেছেন তিনি। এই প্রবন্ধ রচনাকালে ৩০ জন ছাত্রী ছিল সেখানে। তারা বিভিন্ন জিনিস, যেমন ঝাড়ন, গামছা, শাড়ি, রেশমি কাপড়, মোজা, গেঞ্জি, লেস, নানা রকম বস্ত্র তৈরি করতে শিখেছে। এরকম সেলাই ফোঁড়াইয়ের শিক্ষা ঘরে ঘরে মেয়েদের থাকা প্রয়োজন বলে লেখিকা মনে করেন। আরও জানিয়েছেন, শুধু বিধবারাই নয়, সধবা নারীও এখানকার ছাত্রী হয়ে তাঁত বোনা বা আধুনিক পোশাক তৈরিতে পারদর্শী হতে পারে।

তবে এ হেন মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের ছাত্রী-সংখ্যা, আর্থিক অবস্থা কিছুই আশাব্যঞ্জক নয় বলে লেখিকা আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। আমাদের সমাজ মেয়েদের বাল্য বিবাহের বিধান দিয়েছে, যে কোনো বয়সের বিধবাদের জন্য কঠোর নিয়ম, চির অন্ধকারময় এক বদ্ধ জীবনের ব্যবস্থাপনা করেছে- বর্বর প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছে, তার জন্য খোলা রাখেনি এক চিলতে আকাশও। ঊনবিংশ শতকে এদের দুরবস্থায় একান্ত ব্যথিত ও মমতা-পরবশ হয়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন, আত্মীয় স্বজনের চির গলগ্রহ, 'অকল্যাণী' রূপে চিহ্নিত এদেরকে জীবনের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করতে চেয়েছেন। কিন্তু সমাজের মন

তাতে গলেনি। মহিলাশিল্পাশ্রমের অতি নগন্য মাসিক চাঁদা জোগাড় করাও দিনে দিনে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, ছাত্রী-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে কমে গেছে। কারো কাছ থেকে স্নেহ না পেয়ে ঘরে ঘরে চলে বিধবাদের নিরানন্দ জীবনস্রোত। পেটের দায়ে অনেককে সমকালে হীনকার্য্যে জীবিকা অর্জনের পথে যেতে হচ্ছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই, তাদের মনে আসছে নীচতা। "যে রমনী আজ ভ্রাতৃগৃহে স্থান পাইলে একাহারে অক্লান্ত পরিশ্রমে হাস্যমুখে ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত– সে রাঁধুনিবৃত্তি গ্রহণে কেমন করিয়া তেলটুকু সরাইব, কেমন করিয়া নুনটুকু সরাইব এই চেষ্টায় বিব্রত থাকে।"[১১] আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া অনিবার্য কাজ, আর নাবালিকার ক্ষেত্রে, তার মনে বিয়ের দিনের স্মৃতি না থাকলেও বিধবাবস্থায় তাকে জীবনের কঠোর কণ্টকময় পথে অবিশ্রান্ত হাঁটতে হবেই। অথচ পশ্চিমের দেশগুলোতে কত মহীয়সী কুমারী নারীর কথা শোনা যায়। অসহায় ভারতীয় মেয়েদের জন্য এখানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন লেখিকা।

'মহিলাশিল্পাশ্রম' একটি মহৎ প্রয়াস, অথচ দিনে দিনে তা হতাশা, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে চলেছে। সামাজিক মানসিকতা বিশ্লেষণ করে এই প্রসঙ্গে শরৎকুমারী বলেন যে, উন্নতির চিন্তা করে দেশের জনসাধারণ মেতে উঠলেও প্রথমে গাছটির যত্ন করলে তবেই যে ফলটি ভালো পাওয়া যায়, তা বুঝতে পারেননি। তবুও, আশাকে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের ধর্ম, তাই লেখিকা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের শুভবুদ্ধির কাছেই আবেদন রেখেছেন হিরণ্ময়ী দেবীর এই প্রয়াসকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য।

মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ত্রিপুরার রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং 'ভারতী'র তৎকালীন সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী বলেন, "এমন দানশীল, সহৃদয়, পরদুঃখকাতর, সরলচেতা অমায়িক রাজা প্রায় দেখা যায় না। সেকালের রাজাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ গল্পকথা শুনা যায় ইহাতে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইত।"[১২] বঙ্গ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এই বিনয়ী রাজার গুণাবলী অল্প কথায় এই সংখ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন 'জনৈক সুপরিচিত মহিলা (শ্রীমতী)' "স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য" নামক রচনায়। এই সুপরিচিত নারী যে শরৎকুমারী, তা আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি। শরৎকুমারী কয়েকবার ত্রিপুরায় গেছেন, মহারাজার স্নেহধন্যাও ছিলেন তিনি। তাছাড়া ঠাকুর পরিবারের নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে যে 'খেয়াল খাতা' বা 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' প্রচলিত ছিল, তার উল্লেখও এই রচনায় থাকায় আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়। তাছাড়া শ্রীযুক্ত সুনীল দাস মহাশয়ের 'ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী' গ্রন্থেও এই মতকেই সমর্থন করা হয়েছে (পৃ. ২৯৭)। রচনাটিতে লেখিকা নিজের হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন মহারাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। বিদ্যার প্রতি অনুরাগী ছিলেন তিনি, নানা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। ধর্মপ্রাণ রাজা সধবা কুমারী পুজো করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপকদের সসম্মানে বিদায় দান করেন, ফলে অধ্যাপকেরা প্রীত হয়ে তাকে 'ধর্ম্মার্ণব' উপাধি দিয়েছিলেন– একথাও লেখিকা জানিয়েছেন। উপসংহারে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাজ-স্মরণে যে গান রচনা করেছিলেন, তার উল্লেখও করেছেন।

'অনন্তগুণের আকর' সেই মহারাজার ঐহিক গুণাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা সহকারে "স্বর্গীয় ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম ধর্ম্মার্ণব মাণিক্য বাহাদুর" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) নামক শোকসন্তপ্ত বার্তাটিও রচনা করেন শরৎকুমারী চৌধুরাণী। মহারাজের শিক্ষা, নানা বিষয়ে পাঠানুরাগ, ধর্মভাবুকতা, ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন ভাষার প্রতি অনুরাগ ও ভাষাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, সঙ্গীত ও চিত্রকলাবিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা, কবিত্ব-শক্তির মাধুর্য

প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা লেখিকা বিস্তৃতভাবে করেছেন। লেখিকার ভাষা, রচনাশৈলী যথার্থভাবেই মহারাজার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শোকার্ত মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। ১২ বৎসরের রাজত্বকালে মহারাজের নানা কীর্তি, প্রজানুরাগ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রজাদের উন্নতিকল্পে তৈরি নানা স্থাপত্য-যেমন হাসপাতাল, স্কুল, বোর্ডিং, নানা রমণীয় সৌধ, দীঘি, সুপ্রশস্ত রাজপথ, বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত শোভাময় আগরতলার স্বর্গীয় সৌন্দর্য প্রভৃতির কথা অতি যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। প্রবন্ধের শেষে বর্তমান মহারাজা স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র 'পঞ্চশ্রীযুক্ত' বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুরের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করতেও তিনি ভোলেননি।

উপসংহার

শরৎকুমারী চৌধুরাণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী, ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলেই ছিল তাঁর বেশির ভাগ চলা-ফেরা। সাধারণ বিষয় দিয়ে লেখা শুরু করে অন্য বিষয়ে, তা থেকে বিষয়ান্তরে গিয়েছেন তিনি। তাঁর সেই সাহিত্য-সাধনার পথ কেমন ছিল, তা-ই হল আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। একবিংশ শতকে বহু যোজন এগিয়ে এসেছে নারী-সাহিত্যিকের রচনাশৈলি, বিশ্বায়ন ঘটেছে তাঁদের মননে। এই ক্রমাণ্বয়ী যাত্রার উৎসস্থলে ফিরে যাওয়ার চেষ্টাতেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের লেখিকাদের মন-মানসিকতা, লেখনী, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এসেছে। সেই অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ববোধ থেকেই এই রচনাটির অবতারণা।

তথ্যনির্দেশ

১. ভারতীর ভিটা ও শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কুরুক্ষেত্র বইমেলা সংখ্যা ১৪২১, সম্পাদনা, সুজন গুপ্ত; কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ ২২।

২. তদেব, পৃ ২৩।

৩. কলিকাতার স্ত্রী সমাজ, ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৮, পৃ ২৩৬।

৪. তদেব, পৃ ২৩৭।

৫. মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলা, ভারতী, পৌষ, ১৩১৬, পৃ ৪৮৩।

৬. ভারতীর ভিটা ও শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কুরুক্ষেত্র বইমেলা সংখ্যা ১৪২১, সম্পাদনা, সুজন গুপ্ত; কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ ২৭।

৭. তদেব।

৮. শ্বাশুড়ী-বৌ, শরৎকুমারী চৌধুরানী, ভারতী ও বালক, আষাঢ়, ১২৯৮, পৃ ১৫৩।

৯. অন্তঃপুর প্রসঙ্গ: লক্ষ্মীর শ্রী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, ভারতী, পৌষ, ১৩১৭, পৃ ৭৮৯।

১০. ভারতীর ভিটা ও শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কুরুক্ষেত্র বইমেলা সংখ্যা ১৪২১, সম্পাদনা: সুজন গুপ্ত; কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ ২৮।

১১. নারীশিক্ষা ও মহিলাশিল্পাশ্রম, শরৎকুমারী চৌধুরানী, ভারতী, ফাল্গুন, ১৩২০, পৃ ১১৯৩।

১২. ভূমিকা, স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য, জনৈক সুপরিচিত মহিলা (শ্রীমতী), বৈশাখ, ১৩১৬, পৃ ২২।